পারমিট

(গল্পগ্রন্থ – নবাগত)

আজই সেই আশ্চর্য ব্যাপারটি আমার জীবনে ঘটেছে।

এমন সব অত্যাশ্চর্য কাণ্ডও মানুষের জীবনে ঘটে যায়। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এখনো ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়চি এক-একবার।...

ভাদ্রের ভরা নদী। উভয়তীরের বনভূমির শাখা-প্রশাখা জলের ওপর নত হয়ে আছে, এক এক জায়গায় জলমগ্ন নল-খাগড়ার বন নদীর স্রোতোবেগে থরথর করে কাঁপছে। এমনিএক স্থানে জলের ওপর কলমি শাকের দাম দেখে নৌকোর মাঝি সয়ারাম শাক তুলতে ব্যস্তহয়ে পড়ল নৌকা থামিয়ে। আমার সঙ্গী নকুড় চক্কত্তি তাকে বকচে— সন্দে হবে, ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে শাক তুলতে!

নৌকো থেমে দাঁড়িয়ে জলের আবর্তে পাক খাচ্ছে। নকুড় চক্কত্তি বল্লে—একটা বিড়ি খাওয়া যাক, কি বলোহে?

আমার ওসব দিকে তত মন ছিল না। তবুও কলেরপুতুলের মতো ওর হাত থেকে বিড়ি নিয়ে ধরালুম। নকুড় চক্কত্তি জলের ধারের ধানগুলো সম্বন্ধে কি যেন বলচে। একবার সে বল্লে—যাক, একটা কাজের মতো কাজ হয়েছে। ধানটা খুব জোর পাওয়া গিয়েছে। তুমি নাগেলে হাকিম কি ধান দিত? হাকিমের স্ত্রী তোমায় চেনে নাকি? ও না থাকলে আজ ধান হত না।ছাই হত!

আমি অন্যমনস্কভাবে বল্লাম—হ্যাঁ।

গল্পে এমন ঘটনা অনেক পড়া গিয়েচে—কিন্তু বাস্তব জীবনে ক'টা ঘটে তাই ভাবচি। একটাও না, অথচ সন্দে পড়লে হয়তো মনে হবে, এমন গল্প অনেক পড়া গিয়েচে। জীবনেরঅলিখিত কাব্যে কত অধ্যায় কত ঘটনা—এর পাঠক কে, না যে সে জীবন যাপন করচে। বহির্দেশে দণ্ডায়মান বিরাট জনতা উৎসুক শ্রোতা হতে পারে, দর্শক হতে পারে, কিন্তু রসিকসমঝদার মাত্র, তার বেশি নয়।

বাগজোলার খালের মধ্যে দিয়ে জলের তোড় মাঠের দিক দিয়ে দু'ধারের ঘন বনের মধ্যেদিয়ে এসে নদীতে পড়চে। জলের তোড়ে একটা প্রকাণ্ড জগডুমুর গাছ শেকড় ছিঁড়ে জলে ঝুঁকেপড়ে আছে। নকুড় চক্কত্তি বল্লে—দ্যাখ তো বাবা সয়ারাম, গাছটাতে যদি কচি কচি ডুমুর পাওয়াযায়! নৌকোটা একটু থামিয়ে পাড় দিকি দু'টো—যা তরিতরকারির দাম, তবুও দুটো ডুমুর নিয়েগেলে কাজ হবে—ধানটা পেয়ে বড় সুবিধে হয়েছে—কি বলো রামলাল?

আমি বল্লাম—হ্যাঁ।

—তোমার আজ হয়েছে কি হে? কোনোদিকে যেন মন নেই—

—যা হয়েছে তা হয়েছে, ধান পেয়েচ তো ?

—ওঃ-দশ টাকায় এক মণ ধান! এ না পেলে তোমার আমারমতো লোকের—

নকুড় চক্কত্তির কথাটা আমার মনে লাগল বটে কিন্তু কথাটা সত্যি, আমাদের মতো অবস্থারলোকের কি অবস্থা হত আজ যদি সুবিধে দরের ধান পাওয়া না যেতো? অথচ আজ নকুড় চক্কত্তি নিজের নামের সঙ্গে আমার নামটা জড়ালে শুনে মনের মধ্যে খচ্ করে উঠল কোথায়।

অনেকদিন আগের কথা। আমার পিসিমার বাড়ি বামুনহাটি থেকে ফিরে আসছিলাম।আমি কলেজ থেকে বেরিয়েচি চার পাঁচ বছর, কিন্তু তখনো কলকাতায় থাকি, ব্যবসাবাণিজ্যের দিকেই চিরকাল মন। এক মাড়োয়ারি ফার্মে কাজ শিখি। এগারো মাইল রাস্তা মেঠো পথ, হেঁটে আসতে আসতে কাপাসীপাড়ার হাটতলায় বাঁধানোপুকুরের চাতালে বসে একটু বিশ্রাম করছি এমন সময় খুব ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় দুটি লোককে আমার দিকে আসতে দেখে একটু আশ্চর্য হলাম।

লোক দুটির মধ্যে একজন ভট্চাজ বামুন, মাথায় টিকি, ফর্সা রং, গায়ে সাদা উড়ুনি। অন্যলোকটা আঠারো-উনিশ বছর বয়সের ছোকরা মাত্র। দুজনেই খুব ঘর্মাক্ত, হাঁপাতে হাঁপাতেযেন অনেক দূর থেকে আসছে।

ভট্‌চাজ মশায় আমার কাছে এসে বল্লেন—ওঃ, ছুটতে ছুটতে এসে ধরেচি! পাওয়া গিয়েচে শেষকালে! তোমার পিসিমার বাড়ি গিয়ে শুনি তুমি আধ ঘণ্টাআগে বেরিয়েচ—তখুনি রমেশকে বল্লাম, পা চালা, রমেশ। ধরতেই হবে পথে।

আশ্চর্য হয়ে বল্লাম—ব্যাপার কি? আপনারা আমায় খুঁজছেন ?

—হ্যাঁ, বাবাজী, হ্যাঁ। দাঁড়াও একটু জিরিয়ে নিই আগে—

মনে মনে ভাবচি এমন তো কোথাও চুরি বা খুন করে পালাচ্চিনে, তবে এরা এমনব্যস্তসমস্ত হয়ে আমার পেছনে ছোটে কেন? কিন্তু কিছু পরেই ভট্‌চাজ মশায় আমার কৌতূহলনিবৃত্তি করলেন। আমায় বল্লেন—তোমায় এখুনি যেতে হবে বাবাজী। এই পাশেই গ্রাম, সীতানাথবাবুর নাম শোনোনি? এ অঞ্চলের জমিদার, তোমার সঙ্গে তার এক মেয়ের সম্বন্ধআমিই প্রস্তাব করেছি। তুমি এসেচ খবর পেয়ে তোমার পিসিমার বাড়ি দৌড়েছিলাম। এটিআমার ভাইপো।

এতক্ষণে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল বটে, কিন্তু সবটা নয়। বল্লাম—কিন্তু আমিসেখানে যাব কেন হঠাৎ?

—মেয়ে দেখতে, মেয়ে দেখতে! তারাই পাঠিয়ে দিয়েচেন আমায়। সীতানাথবাবুবল্লেন—নিয়ে এসো তাঁকে।

—তিনি কি করে জানলেন আমি পিসিমার বাড়ি গিয়েচি—

—তোমার যাবার দিন আমি তোমাকে দেখেছিলাম বাবাজী। সেদিন হাটে তোমার পিসেমশায়ের সঙ্গে দেখা, তিনি বল্লেন, তুমি ওখানেই আছ। আমি এসে সীতানাথবাবুকে বলতেই তিনি বল্লেন, নিয়ে এসো, মেয়ে দেখে যান তিনি।

আমার মনের খটকা গেল না। কোথাও কিছু ভুল হয়ে থাকবে হয়তো! আমি বিবাহকরার জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠিনি। আমার পিসেমশায়ের বাড়ি দু'বছর পাঁচ বছর অন্তর একবার যাই, তিনিই বা কি করে জানলেন আমি বিয়ে করব কিনা!

হঠাৎ আমার মনে একটা তীব্র কৌতূহল হল। এমন ভাবে রাস্তা থেকে ডেকে কেউআমাকে কখনো মেয়ে দেখাতে নিয়ে যায়নি। সীতানাথবাবু কেমন জমিদার, কেমন তার মেয়ে, এ আমায় দেখতে হবে।

ওরা দু'জনে আমায় নিয়ে পাশের এক রাস্তা ধরলে। সে রাস্তার দু'ধারে ঘন বাঁশবন, কাপাসীপাড়ার কুম্ভকার পাড়া ছাড়িয়ে একটা খুব বড় মাঠ, মাঠের মধ্যে অনেক দূরে কাদের একটা সাদা রংয়ের বাড়ি। ভট্‌চাজ মশায় বল্লেন—ওই হল রায়েদের বাড়ি—এ অঞ্চলে নামডাকআছে ওদের, বংশও খুব ভাল—নাম শোনোনি?

আমিই বিনীত ভাবে বল্লাম, আমার এ অঞ্চলে তত বেশি যাতায়াত নেই। কাজেইঅনেক লোকেরই নাম শুনিনি।

একটা সাবেক আমলের বড় বাড়ির সামনে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম। বাড়িটা দেখেইবুঝলাম, এক সময়ে এ-বাড়ির মালিকেরা দেশের জমিদার ও শাসক ছিল, যদিও এখন এদেরসে অবস্থা নেই। থাকলে রাস্তা থেকে ডেকে এনে আমায় মেয়ে দেখাতো না।

একটি বেশ সুন্দর মতো ছোকরা আমাদের ডাক শুনে বাইরে এল, তারপর এলেনবাড়ির কর্তা স্বয়ং সীতানাথ রায়। আমাদের সাদরে নিয়ে গিয়ে বসালেন বৈঠকখানার মধ্যে। খুব বড় সাবেকী বৈঠকখানা, দেওয়ালে বড় বড় হরিণের শিং, ঝাড়লণ্ঠন টাঙানো, বড় বড় পুরানোবিবর্ণ ছবি ভেতরে বাইরে ঝুলানো। বৈঠকখানার এক পাশের তক্তপোশের ওপর অনেকগুলিবাদ্যযন্ত্র-সেতার, তানপুরা, ডুগিতবলা ইত্যাদি। মনে হল সেগুলো ব্যবহার করবার লোকআছে এ বাড়িতে। বেশ যত্নে তদ্বিরে গুছিয়ে রাখা। এক কোণে আট দশ গাছা বড় হুইলেরছিপ। ভট্‌চাজ মশায় আমায় দেখিয়ে বল্লেন—এই ইনিই, এরই নাম রামলাল চাটুয্যে—

এমন কিছু বিখ্যাত লোক আমি নই, অথচ কথার ভাবে মনে হল আমার সম্বন্ধে এঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েছে। সীতানাথবাবু আমার দিকে চেয়ে বল্লেন— আপনার পিসেমশায় ভবশঙ্করবাবুর সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয়। তিনি আমার সঙ্গে একবার আপনার কথা বলেছিলেন, তখন আপনি কোথায় পশ্চিমে চুনের ব্যবসা করতেন—খুব ব্যবসার ঝোঁকআপনার—এই তো চাই বাঙালির, চাকরি চাকরি করে দেশ উচ্ছন্ন।

বিনীতভাবে বল্লাম—চুনের ব্যবসা করিনে, করবার চেষ্টায় গিয়েছিলাম বটে।

—কোথায় যেন সেই ?

—আজ্ঞে পশ্চিমে, বিন্ধ্যাচলের কাছে। ঘুটিং পাথর কিনে পুড়িয়ে চুন করে, সেখানে বড়বড় ভাঁটি আছে চুন পোড়ানোর।

—এখন কি করা হয় আপনার?

—বিজনেস করি কলকাতায় এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগে। আমাকে আপনি বলবেন না, আপনি পিসেমশায়ের বন্ধু, আমাকে—

—তাতে কি?তাতে কি বাবাজী! ব্রাহ্মণসন্তান, কুলীনের সন্তান, সব নমস্য। কত বড় কুলীন বংশ আপনারা—

এইবার খানিকটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সীতানাথ রায় মশায় পুরাতনপন্থীলোক, এখনো কৌলীন্য মানেন, আমাদের কুলীন হিসেবে একসময়ে বেশ নামডাক ছিল বাবা বলতেন। এখন আর ওসব কে মানে বা গ্রাহ্য করে? তবে এই সব অজ পাড়াগাঁয়ে—

সীতানাথ রায় মশায়ের চেহারা আমার খুব ভাল লেগেছে। বেশ লম্বা, দোহারা, ফর্সাচেহারা, মাথার চুল ধবধবে সাদা, মুখশ্রীতে একটা সদানন্দ, উদার অথচ একটু যেন নির্বোধেরভাব। তাতে মানুষকে আরো বেশি আকৃষ্ট করে তার দিকে। আমি নিজে তো ধূর্ত মানুষেরচেয়ে নির্বোধ লোক ঢের বেশি পছন্দ করি।

আমায় বল্লেন—আমার বড় আনন্দ হচ্ছে আপনি আজ এসেছেন আমার বাড়ি বিয়েহোক না হোক, সে ভবিতব্য, কিন্তু আপনার আসাতেই—

গ্রামের দু'তিনটি ভদ্রলোক, কেউ কোঁচার টিক গায়ে, কেউ একটা আধময়লা পাঞ্জাবিগায়ে, এসে বৈঠকখানায় ঢুকে আমাদের দিকে চেয়ে নমস্কার করে বসলেন অন্যদিকে। রায়মশায় বল্লেন—ওদিকে কেন, সরে আসুন, সরে আসুন—এই ইনিই রামলালবাবু—আলাপপরিচয় করুন—

কিন্তু তারা নিতান্ত গ্রাম্য লোক, আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে তাদৃশ সাহস করলেন না বোধ হয়। একটু পরে তাদের একজন নিজেই তামাক সেজে টানতে লাগলেন।ভট্চাজ মশায়ও তামাক খাবেন বলে ওদিকে উঠে গেলেন। আমি আর রমেশ এদিকে বসেরইলাম। সীতানাথ রায় মশায় একটু পরে বাড়ির ভেতর থেকে এসে বল্লেন—চলুন, একটুমিষ্টিমুখ করবেন।—অজ পাড়াগাঁয়ে এইটিই বলা রীতি। একটু শহর-ঘেঁষা জায়গা হলে বলতোচলুন, চা খাবেন।

বৈঠকখানা ছাড়িয়ে খুব বড় একটা হলঘর পার হয়ে ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকেইবারান্দাওয়ালা কুঠুরির সারি। অনেকগুলি কুঠুরি, আট-দশটার কম নয়, তারপর আবার খোলারোয়াক, পুব পশ্চিমে লম্বা। তারপর চাতাল বাঁধানো উঠান পার হয়ে ওদিকের আর একটা বড় টানা ঢাকা বারান্দায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। আমি চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম। প্রাচীন জমিদার-বাটী বটে। ভেতরটা আগাগোড়া চকমেলানো, খুব উঁচু কার্নিশযুক্ত ছাদ—তবে সেকেলে বাড়ি, ছোট ছোট দরজা জানালা।

বারান্দায় আট-দশজন লোকের প্রচুর জলযোগের আয়োজন সজ্জিত ছিল। সীতানাথ রায় মহাশয়ের প্রৌঢ়া গৃহিণী সকলকে লুচি পরিবেষণ করলেন—কারণ এখানে বাইরের লোকেরমধ্যে এক যা আমিই আছি, আর সবাই এই গ্রামেরই লোক। আমার মনে হল, তিনি লুচিপরিবেষণের ছলে আমায় দেখতে এসেছেন এবং বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গেই আমার দিকেচেয়ে চেয়ে বারবার দেখছেন।

জলযোগান্তে রায়-মশায় আমায় পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়েদিলেন। আমি পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বল্লেন—এসো বাবা এসো—

মনে হল ঠিক যেন নিজের মা।

আমায় আর একটি বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন গৃহিণী নিজে।বল্লেন—বড় কুলীন বংশ, যদি এখন আমার মেয়ের শিবপুজোর জোর থাকে—তোমরাপাঁচজনে আশীর্বাদ করো—

এঁরা আমার সঙ্গে যে অমায়িক, হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করলেন, শুধু এই সব পল্লীগ্রামেইতার তুলনা মেলে। নিজে আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম এঁদের আত্মীয়তায়। জানালা দিয়েচোখে পড়ছে...ওঁদের চকমেলানো ছাদের ওপর ঝুঁকে-পড়া নারিকেল বৃক্ষের কম্পমান শাখা-প্রশাখা।

একটু পরে বাইরের ঘরে মেয়ে দেখানো হল।

মেয়ে সুন্দরী না হোক, বেশ দেখতে শুনতে। বড় ঘরের মেয়ে বলে বোধ হয় বটে। সীতানাথ রায় মশায় নিজে যত্ন করে মেয়েকে গানবাজনা শিখিয়েছেন। বল্লেন—ভট্চাজ মশায়, বিনু আমার গান-বাজনা জানে, সেতার বাজাতে পারে—সেটা একটু শুনতে উনি যদি চান—

আমি সলজ্জমুখে চুপ করে রইলাম। ভট্চাজ মশায় বল্লেন—হ্যাঁ হ্যাঁ—বিনু দিদি, ধরোএকবার সেতারটা—

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভভাবে গিয়ে বৈঠকখানার ঢালা বিছানায় বসে সেতার বাজালে, সীতানাথ রায় মশায় নিজে ডুগি-তবলা ধরলেন। আমি গান-বাজনা বিশেষ কিছু বুঝিনে, করি কয়লা আর চুনের আড়তদারি, তবুও মনে হল মেয়েটি কাঁচা হাতে সেতার ধরেনি। সেতার নামিয়ে খানিক পরে যখন সে দুটি গান গাইলে, তখন মেয়েটির কণ্ঠস্বর আমার কাছে বেশভালই লাগল। তবে ওই যে বল্লুম, ও জিনিসের সমঝদার নই আমি।

সেই অপরাহ্নটি আমার জীবনের এক অদ্ভুত অপরাহ্ন বটে। দূরসম্পর্কের পিসিমার বাড়িথেকে ফিরচি, থাকি কলকাতায়, যখন আসি বাড়িতে কালেভদ্রে, তখন হাঁটাপথে এগারো-বারোমাইল পথ নানা ধরনের পাড়াগাঁ, বিল, বাঁওড়ের মধ্যে দিয়ে যাবার প্রলোভনেই পিসিমার বাড়িযাই—বিশেষ কোনো আত্মীয়তার টানে নয়।

সেই পথে ফেরবার সময়ে এ যেন এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। কখনো শুনিনি যাদের নাম, তাদের বাড়িতে এসে এমন অমায়িক ব্যবহার পাওয়া আমার কাছে সম্পূর্ণ অভিনব। এই প্রাচীনজমিদারবাড়ি, ওই ভাঙা পুজোর দালানের কার্নিশে বটচারাটা, জানালার বাইরে ওই গোলার সারি, এই সুগায়িকা মেয়েটি—সব যেন স্বপ্ন। আমি জানি এ বিয়ে হবে না, বিয়ে করার ইচ্ছে নেইও আমার, থাকলেও উপায় নেই—ব্যবসা-জীবনের সবে আমার শুরু, এখন বিয়ে করে নিজেকে সংসার-জালে জড়িত করতে চাইনে আমি। তা ছাড়া ওঁরা অনেক কিছু ভুল খবর শুনেচেন আমার সম্বন্ধে, এটা ওঁদের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলাম। আমি সামান্যই ব্যবসা করি, তাও একটি বন্ধুর সঙ্গে ভাগে। সামান্য পুঁজির উপর ব্যবসা—এমন কিছু আয় হয় না যাতে কলকাতা শহরে বাসা করে পরিবার নিয়ে সচ্ছলভাবে থাকা যায়।

এমন সময় ভট্চাজ মশায় এমন একটি কথা বল্লেন যাতে আমি একেবারে অবাক হয়েতাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি বল্লেন—বাবাজীর নিজের বাড়ি আছে কলকাতায়, নিজেই করেচেন—

রায়মশায় বল্লেন—হ্যাঁ, সে তো আপনি বল্লেন সেদিন—

আমি অবাক! ভট্চাজ মশায় জেনেশুনে মিথ্যে কথা বলচেন ঘটকালি অগ্রসর করবার জন্যে, না উনি আমার সম্বন্ধে ভুল খবর পেয়েছেন?

আমি তখনি প্রতিবাদ করতাম কিন্তু হঠাৎ কেমন দুর্বলতা এসে গেল মনে। ওই যে মেয়েটি এখানে বসে আছে, ওর কাছে এখুনি এত খেলো হব কেন? বিয়ে হবে না জানি, মেয়েটি উঠে যাক—আমিও এখান থেকে চলে যাই—তারপর আমি যা করব তা আমার জানাইআছে।

রায়মশাই বল্লেন—তাহলে মেয়েটিকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে পারি?

অপরাধের বোঝা যথেষ্টই ভারী হয়েছে তার কাছে আমার। আর নয়—আমি মেয়েকে নিয়ে যেতে বল্লাম। একটু পরে এল বাড়ির মধ্যে থেকে মেয়ের হাতের নানারকম সূচেরকাজকর্ম—একটি রাশ। কত রকমের তুলোর কুকুর, পশমের আসন, রুমাল, টেবিল-ঢাকাকাপড়, মাছের আঁশের হাঁস, ফ্রেমে বাঁধানো—ইত্যাদি। একটি সুদর্শন ছোট ছেলের সঙ্গে একজন ঝি সেগুলো নিয়ে এসে আমার সামনে রাখলে। গিন্নিমা নাকি সেগুলি পাঠিয়েছেন।

আরো আধঘণ্টা।

এইবার রওনা হতে হবে। ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সীতানাথ রায় মশায়আমাকে প্রথমে কিছুতেই আসতে দেবেন না, রাত হয়ে আসচে—এখন তিনি আমায় ছেড়েদিতে পারেন না। রাত্রে এখানেই থাকতে হবে।

আমি বল্লাম—কোনো অসুবিধে হবে না, মঙ্গলগঞ্জের ঘাটে নৌকো ভাড়া করে চলেযাব। সে ঘাট তো মোটে দু'মাইল। জ্যোৎস্নারাত্রে বেশ চলে যাব।

সীতানাথ রায় মশাই আমার সঙ্গে একাই খানিক দূর হেঁটে চললেন। বল্লেন—আপনাকেআর বেশি কি বলব, মেয়ে আমার বড় ভাল।

—আজ্ঞে নিশ্চয়ই।

—আপনার মতামতটা যদি জানাতেন—

—সেটা আমার মামার সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে জানাব, কারণ মামাইবলতে গেলে এখন অভিভাবক—

বলা বাহুল্য, যে মাতুলকে কর্মকর্তা বলে নির্দেশ করলাম, তার খবর পর্যন্ত রাখিনি আজতিন. চার বছর।

বল্লুম—তাহলে আপনি আর এগোবেন না—সন্দে হয়ে এল—

স্থানটি নির্জন। গ্রাম ছাড়িয়ে বড় একটা বিল ডান দিকে, সামনে ধূধূ মাঠের বুক চিরে সাদা বালির রাস্তা সোজা পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে। কেউ কোথাও নেই।

রায়মশায় এদিক ওদিক তাকিয়ে সুর নীচু করে বল্লেন—যাতে এ হয়, তা তোমাকেকরতেই হবে বাবাজী। আমার স্ত্রীর বড্ড পছন্দ হয়েছে তোমাকে, আমায় ডেকে বলছিল। আরকি জানো, বাইরে ঠাট যতই দ্যাখো, তেমন অবস্থা তো আর নেই। তোমার মতো সুপাত্রকোথায় পাব। দেনাপাওনার জন্য কিছু আটকাবে না—তোমার কলকাতার বাড়ি সাজানোআসবাবপত্র দিতে পারব না হয়তো, তবে মেয়ের গা-সাজানো গহনা দেব। ত্রিশ ভরি সোনা দেব, ওর গর্ভধারিণীর যা আছে, তা দুই মেয়েকে তিনি ভাগ করে দেবেন। তাহলে মনে থাকে যেন বাবাজী—

এই প্রথম তিনি আমায় ঘনিষ্ঠ সম্বোধন করলেন।

চলে এলাম সেদিন এবং কয়েকদিন পরে কলকাতাতেও এলাম। তারপর আমি কোনো উচ্চবাচ্য করিনি এ বিষয়ে। সীতানাথ রায় মশায় পত্র দিয়েছিলেন, লোক পাঠিয়েছিলেন। বহুঅনুরোধ করেছিলেন—শেষ পর্যন্ত যদি আমি বিবাহ করি, উৎকৃষ্ট ধানের জমি মেয়ের নামেলেখাপড়া করে দিতে চেয়েছিলেন, প্রায় পনেরো বিঘে। বড়ই দুঃখের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবপ্রত্যাখ্যান করতে হল আমায়। তিনি আগাগোড়া ভুলের ওপর যে বাড়ির ভিত পত্তন করেছিলেন, সে ভিতের ওপর আমি বাড়ি তুলতে পারিনি!

সব কথা খুলে বলিনি কেন?

তখন বয়স ছিল কম। গর্বে বাধে, মুখ ছোট হয়ে যায়। এখন হলে সব খুলে বলতাম, তখন তা পারিনি।

এখন দেশেই আছি। এই যুদ্ধের বাজারে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার চালানো বড়ই কষ্ট। ব্যবসা অনেকদিন নষ্ট হয়ে গিয়েচে—বন্ধুই হোক আর যে-ই হোক, ভাগে ব্যবসা না করাইভাল—এই অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতা ক্রয় করতে হয়েচে অতি কষ্টে উপার্জিত হাজার সাতেকটাকার বিনিময়ে।

সেদিন প্রভা বল্লে—সামনের মাসে ধান ফুরিয়ে যাবে। ছত্রিশ টাকা চালের মণ, কি করেএই পুরীপাল্লা চালাব! সস্তায় নাকি কন্‌ট্রোলের ধান দিচ্ছে মহকুমায়—চেষ্টা দেখো না?

তাই আজ ক'দিন ধরে হাঁটাহাঁটি করছি মহকুমায়। ধান সস্তায় দেবার মালিক এক বড় অফিসার, তিনি কলকাতা থেকে এসে দিন পনেরো আছেন। তার আরদালি ক'দিন ফিরিয়ে দিয়েচে।

আজ নকুড় চক্কত্তি বল্লেন, এমনি না হয়—একজন উকিল ধরে হাকিমের কাছে দরখাস্তদিতে হবে। রোজ হেঁটে আর পারিনে—

তাই দু'জনে মিলে একখানা নৌকো ভাড়া করে এসেছিলাম।

বেল দশটার সময় হাকিমের বাসার ফটকে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনা, ভেতরে ঢুকতেও সাহস হয় না। এমন সময় হাকিমের ছোকরা আরদালিকে আসতে দেখে তাকে বল্লাম—ওহে শোনো, আমাদের দরখাস্তখানা নিয়ে যাও না সাহেবের কাছে?

হাকিম বাঙালি হলেও তাঁকে সাহেব বলাই নিয়ম।

লোকটা ইতস্তত করচে দেখে নকুড় চক্কত্তি তাকে দু'আনা পয়সা দিয়ে বল্লে—পান বিড়ি খেয়ো। আমরা গরিব লোক, নয়ে যাও দরখাস্তখানা, আজ ন'দিন হাঁটাহাঁটি করচি। ধান মঞ্জুরহলে তোমায় আরো কিছু দেব—

আরদালি কি ভেবে দরখাস্ত নিয়ে চলে গেল।

দু'ঘণ্টা কারো দেখা নেই—কেউ ডাকে না। সাহেব তো দূরের কথা, আরদালিরও চুলেরটিকি আর দেখা যায় না। নকুড় চক্কত্তি বল্লে—কি ব্যাপার হে, দু'আনা পয়সাই গেল এ বাজারে—থাকলে তবুও ছেলেপিলের জন্য দু'খানা গজা-টজা নিয়ে গেলে—

এমন সময় সেই ছোক্‌রা আরদালি বারান্দায় বেরিয়ে বল্লে—রামলালবাবু কার নাম ?

নকুড় চক্কত্তি বল্লে—যাও হে, তোমার ডাক পড়েছে—দেখে এসো—আমার কথাটাওএকটু বোলো। না খেয়ে মরে যাবে ছেলেপিলে—

বারান্দা পার হয়ে সামনের সাজানো মাঝারি গোছের ঘরে ঢুকেই আমি সামনে একটি মহিলাকে দেখে একেবারে চমকে গেলাম। থতমত খেয়ে সরে যাব কিনা ভাবছি, এমন সময়ে মেয়েটি হাত তুলে আমায় নমস্কার করলে। আমি আরো থতমত খেয়ে গেলাম।

হাতের একখানা কাগজ দেখিয়ে মেয়েটি বল্লে—এ দরখাস্ত আপনি করেচেন? আমি আপনার নাম দেখে বুঝেচি আর গ্রামের নাম দেখে—আমায় চিনতে পারলেন না?

নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে মেয়েটির দিকে ভাল করে চাইলাম। কোথায় যেনদেখেচি, কিন্তু মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেচি।

মেয়েটি মৃদু হেসে বল্লে—আমাদের বাড়ি আপনি গিয়েছিলেন—আমার বাবার নামশ্রীসীতানাথ রায়, কাপাসীপাড়া—

আমার সমস্ত শরীর যেন কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচে। এই সেই স্মৃতি, সীতানাথরায়ের মেয়ে।

মেয়েটি আবার বল্লে—আমি আপনাকে আরো দু'দিন দেখেচি। দেখেই চিনেছিলাম, একটু সন্দেহ ছিল—আজ দরখাস্তে আপনার নাম দেখে আর সন্দেহ রইল না। উনি একটু বিশ্রামকরচেন। আপনার দরখাস্ত ওঁকে বলে মঞ্জুর করিয়েচিনিয়ে যান। চেহারা খারাপ হয়ে গিয়েছেআগেকার চেয়ে। একটু চা খাবেন?

আমি যেন সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে বল্লাম—না-না—এখন থাক্—

মেয়েটি হাত তুলে নমস্কার করে বল্লে—এবার এখানে এলে কিন্তু আবার দেখা করবেন। ওঁকে বলেচি আমার বাপের বাড়ির দেশে আপনার পিসিমার বাড়ি। অবিশ্যি আসবেন, চা খাবেন সেদিন—

আমি দরখাস্ত হাতে নিয়ে বার হয়ে এলাম। সস্তায় দু'মণ ধানের পারমিট পেয়েছি।স্ত্রী-পুত্র এখন দু'মাস খেয়ে বাঁচবে।